OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 329 - 336
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাস : চর্যাপদের পুনর্নির্মাণ ও সাধারণ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই

তনুশ্রী মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কুশমণ্ডি
Email ID: tanusreemandal4u@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
language movement, independence movement, power structure, common people.

Abstract
The novel ‘Neel Mayurer Jauban’ written by Selina Hossain. In this novel, the author has reconstructed the events of Charyapad. Charyapad- a symbol of the ancient Bengali language. The language movement in Bangladesh took place in 1952. Then in 1971, a movement was held to form an independent state. Bangladesh separated from the Pakistani state and declared itself as an independent state on December 16, 1971. The author has expressed this language movement and independence movement in Bangladesh on the basis of Charyapad. She has compared the social system of Bengal during Charyapad's time with the social situation of the present Bengali country. Just as the common people of Bangladesh stood against the power structure and formed an independent Bangladesh, the characters in Charyapad also dream of their own separate and independent territory. This awakening and struggle of the common people has been analyzed in this article.

Discussion

চর্যাপদ - প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন। সময়কাল - আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী, মতান্তরে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। এই সময় বাংলা ভাষার গড়ে ওঠার কালপর্ব। বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষা তৈরির প্রাথমিক সময়পর্ব এটি। নব্য ভারতীয় আর্যের স্তরে মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে অপভ্রংশ, অবহট্ঠ এর স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষার জন্ম। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগের সময়পর্ব থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে বাংলা লিপি তথা বর্ণমালা নির্দিষ্ট রূপে স্থিত হয়েছে। অন্যদিকে ভাষা বহতা নদীর মতো, ক্রমাগত তার বয়ে চলা ও পরিবর্তিত হওয়া। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা প্রত্যেকে বাঙালি। স্বাধীনতার পর দেশভাগের উত্তরপর্বে তৈরি হয় দুটি নতুন রাষ্ট্র - ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাঙালি অধ্যুষিত প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পর ইসলাম প্রধান মানুষের রাষ্ট্র হিসেবে। অবহেলিত হয় বাংলা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হওয়া সত্ত্বেও। রাষ্ট্রীয় অবহেলার স্বীকার হতে না দিয়ে বাংলা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। এই মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ইতিহাস রক্তে রাঙা। কেবল ভাষার প্রশ্নেই নয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় সমস্ত বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য অস্বীকার করে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। সেই ইতিহাসকে স্মরণে রেখে চর্যাপদের পদ থেকে উপাদান গ্রহণ করে সেলিনা হোসেন লিখেছেন উপন্যাস 'নীল ময়ূরের যৌবন'। উপন্যাসে চর্যাপদের ঘটনাকে বহিরাবরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে কাহিনির মোড়কে রেখে তার অন্তরালে তিনি স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যূথবদ্ধ হয়ে ওঠাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ মানুষের একত্রিত হয়ে কেবল ভাষার অধিকার নয়, বেঁচে থাকার অধিকার ফিরিয়ে আনার ইতিহাসকে চর্যার আবরণে, লেখিকা প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষের সেই লড়াইয়ের ইতিহাস এই নিবন্ধের আলোচ্য।

সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসটি ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের নাম - 'আপনা মাঁংসে হরিণা বৈরি' অর্থাৎ হরিণ তার নিজের মাংসে নিজেরই শত্রু। উক্তিটি চর্যাপদে ব্যবহৃত হয়েছে ভুসুকু পাদের ৬নং পদে। চর্যাপদে উল্লিখিত চরিত্রগুলি নিম্নবর্ণের প্রান্তিক জনসমাজের মানুষ। সেই নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষকে উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন লেখিকা। প্রাচীন বাংলায় জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর্যরা এদেশে আসার পর বাংলার আদিম অধিবাসীরা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। শূদ্রশ্রেণীর মানুষেরা তাদের সামাজিক অবস্থানের জন্যে অবহেলিত। অপমানিত হতে হতে একসময় সেটাকেই তারা ভবিতব্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছে। এই অবসরে উচ্চবর্ণের অন্যায়ের স্তর জমতে থেকেছে ক্রমে। চর্যাপদের গানগুলিতে নিম্নসমাজের মানুষের অপমানিত হওয়ার কথা জানতে পারা যায় কিন্তু তাদের প্রতিবাদ জানা যায় না। সেলিনা হোসেন তাঁর উপন্যাসে এই মানুষগুলির প্রতিবাদী হওয়ার কথা জানান। নিরুপায় মানুষগুলি অন্যায়ের প্রতিবাদে একসময় ঘুরে দাঁড়ায়। পাল্টা প্রতিরোধ করে।

প্রাচীন বাংলার বিশেষত, পালরাজাদের শাসনকালে বর্ণভেদে বিভক্ত সমাজের মানুষের সামাজিক অবস্থান, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জীবিকা সম্পর্কে জানা যায় –

> "এই চিত্রের একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামনার সোৎসাহ আতিশয্য। রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরলরুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন, ধর্ম-আচরণে ভেদবুদ্ধি, নিন্দনীয় যৌন কামনা, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা- জীবনের সমস্ত দিকে কদর্যতার সমাবেশ। আর অন্যদিকে নিদারুণ ক্ষুধা, অভাব, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য-রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে অসাড়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধোগতি অবাধ, শিল্প সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধরহিত, নিতান্ত ভাব কল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত।"[১]

এই তথ্যগুলিকে যথাযথ রেখে চর্যাগানে উল্লিখিত চরিত্রগুলির নাম গ্রহণ করে উপন্যাসের কাহিনিকে রূপদান করেছেন লেখিকা। ইতিহাস থেকে জানা যায় পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্টপোষকও বটে। পাল আমলে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান, রাজসভায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মানুষের আধিপত্য লক্ষণীয়। তাই উপন্যাসে লেখিকা বৌদ্ধরাজা বুদ্ধ মিত্র ও তার মন্ত্রী হিসেবে দেবল ভদ্রকে নির্বাচিত করেছেন। চর্যাপদে কাহ্নপাদের লেখা পদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কাহ্নপাদ উপন্যাসের কাহিনির নায়ক। চর্যাপদে শবরপাদ লিখিত পদে শবর দম্পতি হিসেবে শবর-শবরীর উল্লেখ পাই। উপন্যাসে শবরী কাহ্নপাদের স্ত্রী। একজন পদকর্তা হিসেবেই কাহ্নপাদের পরিচয় নির্মাণ করেছেন লেখিকা। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বসতিতে বাস কাহ্নপাদের। সেই জনপদের সকলেই তাকে ভালবাসে। চর্যাপদে সাধারণ মানুষের জীবিকার প্রসঙ্গ উল্লিখিত। সেখানে জীবিকা হিসেবে চাঙ্গাড়ি বোনা, নৌকা চালানোর কথা এসেছে। অবসরে দাবা খেলার কথা এসেছে। শিকার করা, মাছ ধরার প্রসঙ্গ এসেছে। লেখিকা এখানে সেই জীবিকার প্রসঙ্গ অনুসরণ করেছেন। নিম্নসমাজের মানুষের অভাবের কথা চর্যাপদে উল্লিখিত। সেই অভাবী মানুষের কথাই লেখিকা উপন্যাসে বলেছেন। তিনি এখানে নাম উল্লেখ না করে সাধারণ একটি জনপদের কথা বলেছেন, যে জনপদে অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। অভাব তাদের জীবনের প্রতি স্তরে। যেখানে মানুষের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলিই পরিপূর্ণ হয় না। জীবনযাপনে তাদের নিজস্ব কোন অধিকার নেই। কাহ্নপাদ কবি। সচেতন অনুভূতিশীল একজন মানুষ। এই অধিকারহীনতা তাকে পীড়িত করে, -

> "কাহ্নুপাদ আনমনা হয়ে যায়। বুকের ভিতর চাপ অনুভব করে। না, রাজা নয়, ও তো সবাইকে নিয়ে তেমন একটা বিশাল ঘর চায় যেখানে ওরা নিজেরাই সব। ওদের ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।"[২]

উপন্যাসের শুরু হয় শবরী ও কাহ্নপাদের দাম্পত্যের প্রসঙ্গ দিয়ে। তবে সে দাম্পত্য আলাপ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পরাধীনতার যন্ত্রণা কাহ্নপাদকে অস্থির করে তোলে, স্ত্রী শবরীর স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে যায়।

> "এই সৌন্দর্য অর্থহীন যদি না বেঁচে থাকা অর্থবহ করা যায়, যদি না বেঁচে থাকার এই পরিবেশ নিজের না হয়, যদি না পরিবেশ প্রভুত্বের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়।"[৩]

এই পীড়ন ও যন্ত্রণাকে কাহ্নপাদ কবিতায় ফুটিয়ে তোলে। উপন্যাসে কাহ্নপাদ জীবিকা হিসেবে রাজসভায় পাখাটানার কাজ করে। সে কাজ তার মনঃপুত নয়। এই কাজে তার সংসার চলে সচ্ছলভাবে তবুও রাজসভার উঁচুবর্ণের অপমান প্রতিনিয়ত তাকে দগ্ধ করে। কলম কাহ্নপাদের হাতিয়ার। নিজের যন্ত্রণা, আনন্দ সবই প্রকাশিত হয় তার কলমে। তার নিজের ভাষায় লেখা কবিতায়। যে ভাষা রাজদরবারে অবহেলিত। পাল আমলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হয়েছে বহুল ভাবে, সে যুগের সমস্ত তাম্রশাসন সংস্কৃতে রচিত। তাম্রশাসনগুলি থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় বাঙালির উৎকর্ষতা যে ছিল তা জানতে পারা যায়। যদিও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ব্যতীত আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অনুমিত হয় যে সংস্কৃত উচ্চবর্ণের ভাষা এবং সাধারণ জনগণের ভাষা হিসেবে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষজন যে ভাষাকে অবহেলা করে। নিজেদের ভাষায় সাহিত্য রচনা করা ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকার নিম্নবর্ণের মানুষগুলির নেই। এই অধিকার অর্জনের জন্যে করতে কাহ্ন স্বাধীনদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখে। কাহ্নর এই স্বপ্নে সামিল হয় তার জনপদের সমস্ত মানুষ। কাহ্নর এই স্বপ্নের মধ্যে লেখিকা পূর্ববাংলার জনতার মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেকার স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকে বুনে দিয়েছেন।

প্রাচীন বাংলার সমাজে উঁচুশ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণরা। উচ্চবর্ণের মানুষ হওয়ায় তাদের সমস্ত কিছুতে একচ্ছত্র আধিপত্য আর নিম্নবর্ণের মানুষরাই যেন আপামর পূর্ববাংলার অধিবাসী। উচ্চবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণের রূপকে যেন পশ্চিম পাকিস্তানের যে আধিপত্য তাকেই লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আলাদা রাষ্ট্র হয় পাকিস্তান। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার প্রশাসনে বাঙালিদের তেমন কোন মত প্রাধান্য পায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের একপ্রকার সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য চলতে থাকে সামগ্রিকভাবে। এই আধিপত্যের ফলে পূর্ব পাকিস্তান শোষিত হতে থাকে ক্রমে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নানা অব্যবস্থা চলতে থাকে। ব্রাত্য করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালিদের। এই অবস্থার প্রতিফলন যেন পড়ে কাহ্নুপাদের কথায় –

> "ও চারিদিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়, আনন্দে চোখে জল আসে। বিধাতা ওদের জন্যে প্রাণ ভরে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু রাজসভায় গেলে টের পায় কিছুই ওদের জন্যে নয়। সব ওদের যারা উঁচুবর্ণের। ওরা ভোগ করবে-খাবে-ফেলবে–ছিটোবে। যেটুকু কাঁটাকুটো তা ওদের জন্যে - যারা নিচু জাতের, যাদের শরীরে নীল রক্ত নেই। ওটুকু চেটেই ওদের খুশি থাকতে হবে, কোন কিছুই চাইতে পারবে না।"[৪]

চর্যাপদের বিভিন্ন পদে উল্লিখিত যে টুকরো টুকরো সমাজচিত্র তাকে একত্রিত করে লেখিকা উপন্যাসে একটি একটি পরিপূর্ণ সমাজের ছবি উপস্থাপিত করেছেন। চর্যাপদের পদে উল্লিখিত চরিত্রগুলিকে চর্যায় উল্লিখিত জীবিকার অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জীবনের একটি পারিবারিক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সে পারিবারিক চিত্রে অভাব, দারিদ্র্য বিদ্যমান। সুজলা সুফলা এই বাংলাদেশ। সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনে প্রবল দারিদ্র্য। রাজা বুদ্ধ মিত্রের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্র। বকলমে তারই শাসন চলে। পাল রাজারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারেও সহায়তা করেছিলেন। তাই বুদ্ধ মিত্রের সঙ্গে কোন বৈরিতা নেই দেবল ভদ্রের। চর্যাপদের সামাজিক অবস্থান ও সময়কালকে লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন ১৯৪৫ পরবর্তী পূর্ববাংলার অবস্থার প্রেক্ষিতে। উপন্যাসে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য চলে। সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষগুলি সম্পর্কে তাদের কোন সহানুভূতি নেই। কেবল ভাষার প্রশ্নেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়, অধিকারের ক্ষেত্রেও এই মানুষগুলি অবহেলিত হয়। রাষ্ট্রের নিপীড়ন চলে প্রত্যহ তাদের উপর। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে নিপীড়ন এই উভয় সংকট তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সমস্ত অপমান মেনে বিদ্রোহী মন নিয়ে কাহ্ন রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে কেবল দারিদ্র্যের জন্যে, –

> "নিজেদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করলে কাহ্নুপাদের ভেতরে এক প্রবল তাড়না হয়। রাজসভায় কত ঐশ্বর্য, কত বিলাস, কত অনাচার, কোন কিছুরই লেখাজোখা নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ওকে নিয়ে যে নাক সিটকানো ভাব দেখায় সেটা মোটেই ওকে স্বস্তি দেয় না, গ্লানি ওকে মরমে মারে। ধর্মে কর্মে, আচার অনুষ্ঠানে বিধি নিষেধের আইন কানুনের হোতা সেজে আছে ব্রাহ্মণরা। এদের প্রতাপকে অস্বীকার করে কার সাধ্য! ভেতরে যত ক্ষোভ, যত জ্বালাই থাক না কেন কাহ্নুপাদকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে এই ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলেই ও এর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে না। পায়ে লাগানো আছে হাজার বেড়ি।"[৫]

নিজেরদের সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, আনন্দকে কাহ্নুপাদ কবিতায় প্রকাশ করে। সেই কবিতা সমাদর পায় না উচ্চবর্ণের কাছে। রাজার কাছে অনেক অনুরোধের পর কাহ্ন বুদ্ধ মিত্রের রাজসভায় তার ভাষায় লেখা গান পড়ার অনুমতি পায়। এই অনুমতি তাকে উৎসাহিত করে। এতদিনে নিজের ভাষার শক্তি দেখানোর একটা সুযোগ পায় কাহ্ন। নিজেদের সমস্ত অপমানের জবাব দিতে ইচ্ছে করে গানের ভাষায়। সমস্ত অপমান, সমস্ত যন্ত্রণাকে ভাষা দিতে ইচ্ছে করে। যদিও শাসকের রোষ, ক্রোধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তাগিদে তাকে ভাষায় আবরণ দিতে হয়। চর্যাপদের পদগুলি সন্ধ্যাভাষায় লেখা। সেখানে দৈনন্দিন জীবন যাপন চিত্রের আড়ালে সহযানী বৌদ্ধধর্মের গুঢ় তত্ত্বগুলির তাৎপর্য অন্তর্নিহিত। এই সত্যকে উপন্যাসে গ্রহণ করে লেখিকা কাহ্নুপাদের লিখিত গানে দ্ব্যর্থকতা প্রবেশ করিয়েছেন। চর্যার গানে যেমন বৌদ্ধধর্মের গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত তেমন কাহ্নুপাদের কবিতার অন্তরালে নিজেদের জীবন যন্ত্রণা প্রকাশিত। তাই কাহ্ন রাজসভায় পড়ার উদ্দেশ্যে লেখে -

> "আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
> তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।
> কাহ্নু কাহঁ গই করিব নিবাস।
> জো মন গোঅর সো উআস।।"[৬]

চর্যাপদের ৭ নং পদ এটি। পটমঞ্জরী রাগে লিখিত। অর্থ - আলিকালির দ্বারা পথ রুদ্ধ হতে দেখে কাহ্ন বিমনা হল। কাহ্ন এখন কোথায় গিয়ে বাস করবে, যারা মন গোচর তারা উদাস। চর্যাপদের অন্তর্নিহিত অর্থ নয় বহিরঙ্গের অর্থই লেখিকা এখানে গ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত রাজসভায় কাহ্ন গীত পড়ার অনুমতি পায় না। অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয় কাহ্নুপাকে। এই অপমান কাহ্নুপাকে শক্তি দেয়, সাহস যোগায়। প্রতিবাদী করে তোলে। কাহ্নুপা তার অপমান ধীরে ধীরে চারিত করতে চায় অন্তেবাসী পল্লির অন্যান্যদের মধ্যে। ঠিক যেভাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ছাত্ররা শুরু করলেও তা ধীরে ধীরে বিস্তারিত হয় সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যেও। আপামর দেশবাসী একত্রিত হয় মাতৃভাষাকে বাঁচানোর তাগিদে –

> "২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলি চালনার পর থেকে ঢাকার সঙ্গে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনে শুধু যে শহরের মধ্যবিত্ত এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ অংশ গ্রহণ করেন তাই নয়। গ্রামের জনগণও বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং মিটিং মিছিল ও বিক্ষোভে অংশ নেন।"[৭]

কাহ্নুপা বলে –

> "রাজসভা থেকে যে যন্ত্রণা নিয়ে ফিরেছি তার দায়ভার এই লোকালয়েরও। আমি উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু বহন করতে হবে সবাইকে। আমার মুখের ভাষার অবমাননা আমাদের সবার। আমার উচিত সবাইকে ডেকে ডেকে এ কথা বলা।"[৮]

মুখের ভাষার অবমাননায় ডোম্বীর প্রতিশোধস্পৃহা জাগরিত হয় –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "তোমাকে যে অপমান করেছে তার শোধ আমি নেবো। কিছুতেই ছেড়ে দেব না। ... পিপুল গাছের হাজার পাতা নড়ে ওঠে। বাতাস মল্লারীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে যায়, ছড়িয়ে যায় লোকালয়ে, সব মানুষের ঘুমন্ত চেতনায় প্রোথিত হয় প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা।"[৯]

এখান থেকেই মূলত শুরু হয় মানুষের জাগরণ। রাজসভার অপমান কাহ্নপাদকে লড়াই করার শক্তি যোগায়। পল্লীর দরিদ্র মানুষগুলিকে বহন করতে হয় সরকারের বিভিন্ন করের বোঝা। রাজা প্রজার অসুবিধার কথা ভেবে দেখে না। এমনকি যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ঘৃণার চোখে দেখে নিম্নবর্ণের মানুষগুলিকে সেই নিম্নবর্ণের নারীর কাছে তারা রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি আসে। অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে তার যৌবন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে এই নিপীড়ন। তাদের ব্যভিচারের কোন শাস্তি নেই সমাজে। ক্রমাগত শোষিত হতে থাকা মানুষগুলির উপর এবারে রাজার তৈরি আইন নিয়ে আসে চরম আঘাত। নতুন আইন তৈরি হয় উচ্চবর্ণের ব্যভিচারের সমর্থনে –

> "এক, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে কোন ধরণের মেলামেশা করতে পারবে, সে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী নাও হয় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনকি তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে সংসর্গ দোষ ছাড়া অন্য কোন নৈতিক অপরাধ হবে না। দুই, অন্যের বিবাহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করা কম দোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।"[১০]

এভাবে আইনত অপমানিত করা হয় মানুষগুলিকে। ব্যবহারিক দ্রব্যে পরিণত করা হয় তাদের, যাদের নিজস্ব কোন সত্ত্বা নেই। নিজের ইচ্ছে নেই। বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যদিও ইতিহাসের তথ্যের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় –

> "বিবাহ ব্যাপারেও অনুরূপ বিধি-নিষেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। পালপর্বে এই প্রসঙ্গে রাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণ নারীর বিবাহ, ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্রকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, এই অনুমান সহজেই করা চলে কিন্তু সেন-বর্মণ-দেব আমলেও চতুর্বর্ণের মধ্যে, উচ্চ বর্ণ বর ও নিম্ন বর্ণ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। ...তবে দ্বিজবর্ণের পক্ষে শূদ্রবর্ণে বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল।"[১১]

কাহ্ন রাজসভায় নিজের লেখা গান পড়তে না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয় ডোম্বী। সে বিক্ষোভ সেভাবে প্রসারিত হতে পারেনি জনপদে। কাহ্নপার অপমান কেউ জানতে পারেনি। সে কেবল সীমাবদ্ধ ছিল ডোম্বী ও কাহ্নর মধ্যে। এই আইন সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে প্রতিক্রিয়া। রাজার ভয়ে তারা প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে না পারলেও তাদের মধ্যে দানা বাধে ক্ষোভ –

> "তরুণরা অসন্তোষের হুল ফোটানো জ্বালা বুকে নিয়ে একে একে সবাই নিজ নিজ কাজে যায়। এ অপমান কারো পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। প্রতিবাদের উপায় চাই। এ কথা কটি প্রার্থনার সঙ্গীতের মতো সবার মুখে।"[১২]

পল্লির সকলেই এই অবস্থার থেকে মুক্তি পেতে চায়। উপায় খোঁজে মুক্তির। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধের পথ খোঁজে তারা। একত্রিত হয়। দেশাখের থেকে তীর চালানো শিখতে চায়। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়।

নবম অধ্যায় থেকেই শুরু হয় বিপরীত ঘটনাপ্রবাহ। প্রথম বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ধনশ্রী। যা অপ্রত্যাশিত। ধনশ্রী চরিত্রটি লেখিকার কল্পিত। ধনশ্রী একজন সাধারণ নির্বিবাদী মানুষ। সে তার স্ত্রী ভৈরবীকে ভালবাসে। গ্রাম্য প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী স্ত্রীলোকের যমজ সন্তান থাকলে তাকে ব্যাভিচারিণী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। তাই ধনশ্রীর স্ত্রী ভৈরবীকে ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন করে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় রাজার আইন অনুসারে। এই প্রথম কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজার আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে। ধনশ্রী জানায় -

> "আমার বৌকে আমি যদি ঘরে রাখি তার জন্যে রাজার কি কানু? আমি মানিনে রাজার আইন। কাহ্নপাদ চমকে ওঠে। তাইতো, ব্যভিচার ওদের জন্যে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা না করলেও তার বিচার হবে!"[১৩]

ধনশ্রী আরও জানায় –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অসতী বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করি তাতে রাজার কী? আমাদের ভালো রাজার দেখতে হবে না। চাই না এমন রাজা।"[১৪]

এই প্রথম কেউ প্রকাশ্যে রাজার আইন না মানার কথা বলে। বিশেষত, ধনশ্রীর মতো সাধারণ মানুষ। যার মধ্যে রাজা, তার শাসন এসব নিয়ে কখনো কোন ভাবনা ছিল না। সংসারের দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। সেই মানুষ মরিয়া হয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই প্রতিবাদের মূল্যও তাকে দিতে হয় নিজের জীবন দিয়ে। রাজার লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না ধনশ্রীর। তার পরিণাম জানা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথা মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে গেছে এমন কত মানুষ। দেশের স্বাধীনতা আনার লড়াইয়ের অপরাধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যাদের নিয়ে চলে যাওয়ার পর আর যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। জাহানারা ইমামের লিখিত 'একাত্তরের দিনগুলি'তে জাহানারা ইমামের সন্তান রুমিরও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমন অনেক রুমি নিখোঁজ হয়েছে –

> "মোশফেকা মাহমুদকে আগে অল্পস্বল্প চিনতাম, তার মুখে শুনলাম ২৬শে মার্চ বাসায় মিলিটারি এসে মামুন মাহমুদকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই যে গেল মামুন, আর ফিরে আসেনি। একই কাহিনী নাজমা মজিদের, মাহমুদা হকের। এরা এদের স্বামীর খোঁজ জানে না। আমি জানি না আমার ছেলের খোঁজ।"[১৫]

নির্বিচারে খানসেনারা হত্যা করেছে বাঙালিকে –

> "আর্মি মিলের অফিস থেকে আজিম ও অন্যান্য বাঙালি অফিসারকে ডেকে মিল এরিয়ার ভিতরে যে পুকুরটি আছে তার পাড়ে নিয়ে গিয়েছে। এই পুকুরের পাড়ে আজিম, অন্যান্য অফিসার ও শ্রমিক মিলে প্রায় তিনশো বাঙালিকে পাকসেনারা ব্রাশফায়ার করে মারে।"[১৬]

ঠিক যেভাবে খানসেনারা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে যুবকদের বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে চলে যায় একই রকম ভাবে দেবল ভদ্রের নির্দেশে পল্লী থেকে যে কোন সময় সামান্য কারণে যাকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তৈরি হয় একরকম থমথমে পরিবেশ। যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লীর জং ধরে যাওয়া জীবনে উৎসাহ ফিরে আসে। নিজেদের পরিচিতজনকে নিখোঁজ হয়ে যেতে দেখে বিক্ষোভ তৈরি হয় সকলেরই অন্তরে, তাই –

> "দেশাখের তীর ধনুকের দলে জোয়ান ছেলে বাড়ে। নিমাই, বাদল, গৌরাঙ্গ, শিবু। ওরা শিকারের নামে দূরের বনে চলে যায়। সারাদিন পর ফিরে এলে আর একটুও ক্লান্তি লাগে না দেশাখের। শরীরে যেন একটা আলগা যন্ত্রের তৈরি হয়েছে। সেটা থেকে অনবরত শক্তি চুঁয়ায়।"[১৭]

এতদিন ধরে সহ্য করে আসা অপমান অসহ্য মনে হয়। তাই রাজসভায় নিজের লেখা গান পড়তে না পারার যে অপমান কানু এতদিন ধরে সহ্য করে আসছিল, আজ তা নিয়ে সে নতুন করে ভাবে। একজনের প্রতিবাদ আরেকজনকে উদবোধিত করে। রাজসভায় নিজের লেখা গান পড়তে না পারায় কাহ্নপার অন্তরে বিক্ষোভ তৈরি হয়। এরপর রাজার কর বৃদ্ধি, নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় আইন, সর্বোপরি রাজার লোক ধনশ্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কাহ্নপাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। নিশ্চিন্ত কর্মজীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে কানু। রাজসভার কাজ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত যেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার করে তার জীবনে। মুক্তি অনুভব করে কানু। শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। বন্ধন মুক্ত হয়ে সে সাহসী হয়। দেবল ভদ্রের মুখোমুখি হয়ে সে জানিয়ে দেয় যে, সে আর কাজ করবে না। কাহ্ন জানে এর পরিণাম কী হতে পারে। দেবল ভদ্র তাকে সহজে ছেড়ে দেবে না একথা সে জানে। নিজেদের জীবনের অপমানের বৃত্তান্ত ভাষার আবরণ দিয়ে লিখে রাখতো কাহ্ন, আর তার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। এই প্রান্তিক জনপদের নিম্নবর্ণের মানুষেরা সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ হলেও তাদের রমণীরা ব্রাহ্মণদের কাছে অচ্ছুৎ নয়। ব্রাহ্মণরা তাদের সম্মতির অপেক্ষা করে না। চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার এই সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে কাহ্ন এবারে আবরণ ছাড়াই তার গানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উচ্চবর্ণের ব্যাভিচারের বৃত্তান্ত। চর্যায় উল্লিখিত কাহ্নপাদের পদ -

> "নগর বাহিরেঁরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
> ছোই ছোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ডোম্বীর অপমানের বৃত্তান্ত এই গানে উচ্চারিত তাই এই গান সে কণ্ঠে ধারণ করে। সমস্ত জনপদে বিস্তারিত হয় এই গান। মানুষগুলির অবরুদ্ধ ক্রোধ যেন ভাষা পায়। তারা অনুভব করে ব্রাহ্মণ্যসমাজের ব্যভিচার, অন্যায়, এবারে সকলের সামনে আসা প্রয়োজন। ডোম্বীর অপমানের প্রতিশোধ নেয় কাহ্ন। সরাসরি স্পষ্টভাবে নিজেদের কথা বলতে পেরে কাহ্ন আনন্দিত হয়। উচ্চবর্ণের মানুষকে অপমান করায় রাজার লোক এসে ধরে নিয়ে যায় কাহ্নপাদকে। সমস্ত জনপদের মানুষের সামনে থেকে তাদের প্রিয় মানুষকে অপমান করতে করতে নিয়ে যায় রাজার লোক। প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনে আসে তৃতীয় অভিঘাত। এই অভিঘাত থেকেই তাদের দুর্বল চিত্ত দৃঢ় হয়। নিজের জনপদের মানুষদের অন্তরে এই দৃঢ়তাই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল কাহ্নপাদ। সে চেয়েছিল এই মানুষগুলির জাগরণ। সামনে এসে কেউ প্রতিবাদ না করলেও অনেকেরই অন্তরে জাগে বিক্ষোভ। সেকথা বোঝে কাহ্ন। তাই সে বিক্ষুব্ধ হয় না। সে ভয়হীন হয়। যে বোধ সে মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল তাতে সে সফল। সে জানে একজন থেকে দুজন, ধীরে ধীরে প্রতিটি মানুষের মনেই এই বিক্ষোভ সঞ্চারিত হবে। হয়ও তাই। মন্ত্রী দেবল ভাদ্রের ভাগিনা খুন হয় ডোম্বীর হাতে। দীর্ঘদিন ধরে জমতে থাকা অপমানের প্রতিশোধ যেন প্রকাশিত হয় এই ঘটনায়। ডোম্বী একটুও ভয় পায় না। ধীরে ধীরে যেন একত্রিত হয় নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা। তাই দেশাখ ডোম্বীর এমন আচরণে এক অদ্ভুত শক্তি পায়। ডোম্বীর প্রতি তার স্নেহ বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুদণ্ড হয় ডোম্বীর। কিন্তু এই মৃত্যু অনেককে জাগিয়ে দিয়ে যায়। অন্যদিকে কাহ্নকে বিজন অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে তার মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টা করে দেবল ভদ্র। কাহ্ন যেন দেবল ভদ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। একদিকে কাহ্ন যার কিছু না থাকা সত্ত্বেও সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় আর অন্যদিকে প্রবল ক্ষমতাবান দেবল ভদ্র, সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অর্থাৎ তথাকথিত ছোটলোকদের এই জাগরণ তথা প্রতিবাদ তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই ডোম্বীর মৃতদেহ তিনদিন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রবল অত্যাচারের পরও কাহ্ন রাজপ্রশস্তি লিখতে রাজি হয় না। কাহ্নর এই অনমনীয় মনোভাব দেবল ভদ্রকে হিংস্র করে তোলে। প্রবল প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে দেবল ভদ্রের মধ্যে। সেই প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই সে কাহ্নকে হত্যা না করে তাকে তিলে তিলে মারতে চায়। যে হাত দিয়ে কাহ্ন গান লেখে সেই দুই হাত কেটে নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

লৌকিক ভাষা যা উচ্চবর্ণের কাছে নিন্দিত সেই ভাষায় গান লেখার অপরাধে ও উচ্চবর্ণের অন্যায়কে গানের ভাষায় ব্যক্ত করায় কাহ্নকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আসে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং তার পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের বৃত্তান্ত। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১এ মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকেই। স্বাধীনতার পরবর্তীপর্ব থেকেই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগের মানুষের ভাষা বাংলা অবহেলিত হয়। বাংলাকে হিন্দু ধর্মের ভাষা বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যুক্তি দেওয়া হয় বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যকে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় উর্দুকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানিঅর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা বিরোধী বিভিন্ন নীতি নেয় পাকিস্তান সরকার। সেসব নীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালের মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় উর্দু পূর্ববাংলার ভাষা নয়। অথচ শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কারণ হিসেবে বলা হয় যে উর্দু ইসলামিক ভাষা। সমগ্র পাকিস্তানকে ধর্মের ভিত্তিতে একত্রিত করে রাখার প্রয়োজনে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলি খান। বাংলা বিরোধী এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রতিবাদ কর্মসূচী - পিকেটিং, প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট পালন। সরকারের পক্ষ থেকেও শুরু হয় সাধারণের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা - আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর পত্রিকা যারা বাংলা ভাষাকে সমর্থন করে তাদেরকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। এমনকি ১৯৫০ সাল থেকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আরবি হরফে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা অমান্য করে পুলিশের গুলিতে তিনজন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। অবশেষে ১৯৫৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No.329 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সালে গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হলে রাষ্ট্রভাষা হয় বাংলা ও উর্দু। অনেক প্রাণের বিনিময়ে বাংলা গৃহীত হয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে।

একদিকে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার লড়াই অন্যদিকে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে গঠনের লড়াই করে পূর্ববাংলার জনতা। বহু প্রাণের বিনিময়ে, অনেক অত্যাচার সহ্য করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়। উপন্যাসে দেখি, দেবল ভদ্র ডোম্বী, কাহ্ন ও জনপদের অন্যান্য মানুষদের কেবল শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, শেষে রাতের অন্ধকারে সমস্ত পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ মানুষ পরিত্রাণ পেলেও কিছু মানুষ নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা যায়। চামড়া পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আসে। সে দগ্ধঘ্রাণ বুকে ধারণ করে মানুষগুলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। নিজেদের স্বাধীন দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখে। নির্বিবাদী যে মানুষগুলি ভবিতব্য মেনে নিত অনায়াসে সেই মানুষগুলি সাহসী হয়, একত্রিত হয়ে জোট বাঁধে। চর্যাপদের ঘটনাবৃত্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই যূথবদ্ধ জাগরণকেই লেখিকা উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।

Reference:

১. মজুমদার, অতীন্দ্র, চর্যাপদ, চৈত্র ১৩৬৭, নয়া প্রকাশ, ২০৬ বিধান সরণী, কল- ০৬, পৃ. ৩৯
২. হোসেন, সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণী, কল-০৬, পৃ. ৩
৩. ঐ, পৃ. ১
৪. ঐ, পৃ. ১৩
৫. ঐ, পৃ. ১২
৬. ঐ, পৃ. ৩৯
৭. উমর, বদরুদ্দিন, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড), ১৯৮৪, বইঘর, বাংলা বাজার রোড, ঢাকা- ১১০০, পৃ. ৪২১
৮. ঐ, পৃ. ৪৭
৯. ঐ, পৃ. ৫০
১০. ঐ, পৃ. ৫৫
১১. ঐ, রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, ভাদ্র ১৩৫২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১০৭
১২. হোসেন, সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণী, কল-০৬, পৃ. ৫৯
১৩. ঐ, পৃ. ১০১
১৪. ঐ, পৃ. ১০২
১৫. ইমাম জাহানারা, একাত্তরের দিনগুলি, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, সন্ধানী প্রকাশনী, ৬৮/২ পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০, পৃ. ১৯৯
১৬. ঐ, পৃ. ১২০
১৭. হোসেন, সেলিনা, নীল ময়ূরের যৌবন, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণী, কল-০৬ পৃ. ১০৫
১৮. ঐ, পৃ. ১২৮